যোগাযোগ উপন্যাসে শ্রেণী সংঘাত ক্ষুণ্ণ দাম্পত্যর ভিন্ন রূপ

শুচিমিতা মৈত্র

অ্যাসোসিয়েত প্রফেসর, স্নাতোকত্তোর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেত

ঘতনা পরম্পরার বিবরণ থেকে সরে এসে রবীন্দ্র উপন্যাস যখন থেকে 'আঁতের কথা' তেনে বের করবার দায়িত্ব নিল, তখন থেকেই দেখা গেল তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'দাম্পত্য সমস্যা'। বিগত শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত দুতি উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩) ও 'নৌকাডুবি (১৯০৬) থেকে শুরু করে কবি-ত্রীবনের একেবারে শেষ পর্বে লেখা দুতি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস দুইবোন (১৯৩৩) ও মালঞ্চ (১৯৩৪) — সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কতি নিয়ে কাতাছেঁড়া করেছেন। 'গোরা' (১৯১০) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে তাঁর ভিন্ন অভীষ্ট ছিল। আর ঘরে বাইরে (১৯১৬) উপন্যাস বৃহত্তর দেশকালের প্রেক্ষাপতে স্থাপিত হলেও তার মূলগত সমস্যা ছিল স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের তানাপোড়েন। তুলনায় যোগাযোগ (১৯২৯) উপন্যাসের সমস্যা সম্পূর্ণই একমুখী। বিবাহিতা নারীর সতীত্বের সংস্কার এবং বাস্তব ত্রীবনে তার প্রয়োগের সমস্যা এই উপন্যাসের প্রধান উপত্রীব্য।

দাম্পত্য সমস্যা কেন্দ্রিক রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রতিতিতে আছে তীব্র মানসিক দ্বণ্ড, যা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশের ফলেই ঘতেছে। মহেন্দ্র-আশার সংসারে বিনোদিনীর আগমন, নিখিলেশ-বিমলার সুখী দাম্পত্যে ধূমকেতুর মত সণ্ডীপের উদয়, শশাঙ্ক-শর্মিলার যৌথ ত্রীবনযাত্রায় উর্মিমালার উপস্থিতি কিংবা আদিত্য-নীরত্তর সাধের মালঞ্চে সরলার অনুপ্রবেশ ডেকে এনেছে অনিবার্য সংঘাত। নৌকাডুবিতে সমস্যা অবশ্য তৃতীয় ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে উঠেনি। রমেশ ও কমলার ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্য যখন মধুর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়তিতেই উদ্ঘাতিত হল এক নির্মম সত্যের মুখ। তবু সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে অনিশ্চিতের বালুকাবেলায় গড়ে তোলা খেলাঘর ভেঙে রমেশ যখন পগ্রহণ করতে চাইল কমলাকে, তখন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো কমলা অস্বীকার করল তাদের বিগত কয়েক মাসের যৌথত্রীবনকে। সতীত্ব সংস্কারই হয়ে দাঁড়াল সেই তৃতীয় ব্যক্তি যার সঙ্গে কমলা ঘর ছাড়ল। কেননা তখনও প্রকৃত স্বামীর কোন স্পষ্ট ছবি তার মনে গড়ে ওঠেনি। তারপর নানা অবিশ্বাস্য ঘতনার মধ্য দিয়ে যেভাবে উপন্যাসে মিলনান্তক উপসংহার নির্মিত হল, তাতে 'আঁতের কথা' কিংবা 'ঘতনা পরম্পরার বিবরণ' কোনতাই বাস্তবানুগ হলনা। এই ধারায় ব্যতিক্রম অবশ্যই 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নয়, দাম্পত্য সমস্যা ঘনীভূত করতে নায়কই যেন এই উপন্যাসে খলনায়কের ভুমিকায় হাত্রির, মধুসূদন এবং কুমুদিনীর সম্পর্কের মধ্যে পাঁচিল তুলেছে মধুসূদনের 'রক্তগত দারিদ্র'। 'রাত্রানী' হবার ভবিষ্যৎবানী শুনে কুমুদিনী এসেছিল মধুসূদনের ঘরে, কিন্তু অচিরেই সে বুঝল অগাধ সম্পদের মর্মমূলে বাসা বেঁধে আছে এই 'রক্তগত দারিদ্র', যা কুমুদিনীর মত রমণীরত্নকে 'দাসীর হাতে' পণ্য হিসাবে হাত্রির করায়। অন্য প্রতিতি উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ক্রমশ ত্রতিল হয়েছে। পূর্ণ দাম্পত্য থেকে ভাঙা সম্পর্কের শ্বাসরোধী ত্রতিলতায় পৌঁছতে সময় লেগেছে এবং সম্পর্ক ভাঙার তীব্র বেদনাও অনুভূত হয়েছে স্বামী স্ত্রী উভয়ের হৃদয়ে। একমাত্র 'যোগাযোগ' উপন্যাসেই তিক্ততা প্রথমাবধি। এই একতি মাত্র উপন্যাসে দেখা গেল ঘনিষ্ঠতম এই সম্পর্কতি ঘিরে সামান্যতম হৃদয়ের 'যোগাযোগ' গড়ে উঠতে পারল না।

কাকে বলে 'রক্তগত দারিদ্র'? উপন্যাসে দেখি ঘোষাল ও চাতুত্তে ত্রমিদারের যে অতীত কাত্রিয়া তাদের বর্তমানেও ছায়া ফেলেছিল, তাতে প্রাথমিকভাবে চাতুত্তেদের তিত হয়েছিল। কারণ তারা ভঙ্গ কৌলীন্যের বানানো অভিযোগে ঘোষালদের দেশছাড়া করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্ত চাতুত্তেরাও যে ধরে রাখতে পারলনা তাদের পুরনো বৈভব, তার কারণ তো নিহিত মুকুণ্ডলালের মত মানুষদের শ্রমবিমুখ বিলাসবহুল ত্রীবনযাত্রায়। আবার অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে শুধুমাত্র নিত্তের পুরুষকারের ত্তেরে মধুসূদন, যে কিনা 'আণ্ডো মুহুরীর বেতা মোধো'—সেই হল 'রাত্রবাহাদুর মধুসূদন ঘোষাল'। উদ্যোগী পুরুষ সিংহই লক্ষ্মী লাভ করেন—এই শাস্ত্রবাক্য মধুসূদনের পেশাগত ত্রীবনে সত্য হলেও দাম্পত্যত্রীবনে অর্ধসত্য হয়েই রইল। যেহেতু মধুসূদনের স্রষ্টার বিশ্বাস 'রাত্রকীয় মহিমা' কোনো খেতাব বা অর্থমূল্যে নির্ণীত হয়না। রক্তের মধ্যে প্রবহমান এক আভিত্রত্যবোধ, পরিশীলিত রুচি, ভীড়ের মধ্যে থেকেও এক সুদূর স্বতন্ত্রানুভূতি, সর্বোপরি অর্থকে মাথায় চড়তে না দিয়ে পায়ে ঠেলার মানসিকতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই 'রাত্রমহিমা'। এই মনোভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবার থেকেই অর্ত্তন করেছিলেন—একথা বলা অত্যুক্তি হবে না। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুক্তো বসানো তুতো পায়ে সভা আলোকিত করার চমকপ্রদ বর্ণনা পাই। তাতে করে অবশ্য অর্থের প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশিত হয় না। অবজ্ঞা আর বৈরাগ্য সমার্থক নয়।

পুরনো বনেদি পরিবারের যে ছবি এই উপন্যাসে পাওয়া যায় তার সঙ্গে মিল আছে ত্তেড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের। বিপ্রদাসের সংস্কৃতি চর্চা, সংগীত চর্চা, দাবাখেলা এমনকি কুস্তিচর্চাও ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের পরিচিত অভ্যাস। সদর-অণ্ডরে বিভক্ত বনেদিয়ানার যে সংস্কৃতি 'ত্রীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'য় বর্ণিত হয়েছে, 'যোগাযোগ'-এ চাতুত্তে পরিবারের বর্ণনা তার খুবই সমীপবর্তী। এমন কি কুমুর বিবাহের আগে তেলেনিপাড়া তিনকড়ি বুড়ি এসে যখন বলে — 'হ্যাঁগা আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাত্র তুতল? ওই যে বেদেনীদের গান আছে —

'এক যে ছিল কুকুরচাতা
শিয়াল কাঁতার বন,
কেতে করলে 'সিংহাসন'।

যোগাযোগ উপন্যাসে.....

—এও সেই শেয়ালকাঁতা বনের রাত্র!'—এই গানতিরও উল্লেখ পাই 'ছেলেবেলা'য়, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর কাছে সংগীত শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে। আর মুকুণ্ডলাল, বিপ্রদাস কিংবা কুমুদিনীর রূপবর্ণনা তো অনিবার্যভাবে মনে পড়িয়ে দেবে ঠাকুর পরিবারের নরনারীদের। কয়েক পুরুষের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিচর্চা এই পরিবারের মানুষদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে যে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে না সে যুগের অন্য যে কোন পরিবারের। ফলতঃ সেই বাড়ির কন্যারাও সাধারণত পিতৃগৃহের চৌহদ্দির মধ্যে রয়ে যেতেন বিবাহের পরেও। কুমুর দুর্ভাগ্য তাকে পিতৃগৃহ থেকে চলে আসতে হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে যেখানে তাকে তার 'নুরনগরী চাল' নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি শুনতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। এতা আসলে কঠোর কর্মব্যস্ততা এবং কর্মবিমুখ সংস্কৃতি চর্চার অনিবার্য সংঘাত। যে সংস্কৃতিচর্চা অর্থকরী নয়, মধুসূদনের তাতে আগ্রহ আসবে কিভাবে? সে তো 'পয়সা পূত্রকেই' তার একমাত্র সংস্কৃতি করে তুলেছে প্রথম যৌবন থেকে। বিপ্রদাসের কাছে স্বামীগৃহ সম্পর্কে কুমুর মন্তব্য 'ওরা আমাকে সুখ দিতে পারবে না আমি এমনি করেই তৈরি'। মনে রাখতে হবে কুমু মূলতঃ তার দাদার হাতেই তৈরি। কুমুর দিদিরা বহু পূর্বে বিবাহিতা। ছোত দাদা সুবোধ বিলাতবাসী এবং বিপ্রদাস অবিবাহিত। অতএব একমাত্র বিপ্রদাসের ছত্রছায়ায় লালিতা কুমুদিনী বাড়িতে এমন কোন মেয়েলি পরিমণ্ডল পায়নি যা তাকে গৃহিণীপনায় শিক্ষিত করতে পারে। দাদার কাছে যে শিক্ষা সে পেয়েছিল তার সবতাই সখ মেতাবার জন্য, দৈনণ্ডিন প্রয়োত্নের তাগিদ তাতে নেই। ফোতোগ্রাফির চর্চা, সংস্কৃত শিক্ষা, বণ্ডুক চালানো, ঘোড়ার যত্ন কিংবা দাবা খেলা কোনোতাই মধুসূদনের সংসারে তার কাতে লাগেনি। একমাত্র সংগীত চর্চা সাহায্য করেছে মধুসূদন এমনকি হাবুলেরও বিস্ময় ও সম্ভ্রম উৎপন্ন করতে। যখন উনিশ বছরের অপরূপা অনূঢ়া তরুণী তার স্বপ্নের রাত্পুত্রকে মনে মনে ডেকেছে যে তার পরিবারকে ঋণত্রল থেকে মুক্ত করবে, বদলে সে তার দাসী হয়ে থাকবে, তখন বাস্তবে তুতল 'শেয়ালকাঁতা বনের রাত্র', যার কাঁতার আঘাতে কুমুর অপাপবিণ্ধ সুকুমার শিল্পী হৃদয় হল ক্ষতবিক্ষত। অথচ অন্যরকমতাই কি হবার ছিল? সেতা কি নিছক স্বপ্নপূরণের গপ্পো হয়ে দাঁড়াত না?

ভরাডুবি থেকে বাঁচতে বিপ্রদাসকে মধুসূদনের কাছ থেকে বারো লাখ তাকা ঋণ নিতে হয়েছিল। তাই পুরনো শত্রুকে আরো পর্যুদস্ত করার জন্য মধুসূদন চাতুত্তে বাড়ির মেয়েকে পাত্রী হিসেবে চাইছে—এই সহত কথাতা বিপ্রদাস বুঝতে পেরেও কি বুঝতে চায়নি? যে কুমু 'চাঁদের আলোর তুকরো' তাকে কিভাবে একত্ন প্রৌঢ় পোড়খাওয়া ঝানু ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিল বিপ্রদাস বোধগম্য হলনা তাও, শুধুই কি কুমুর ত্তে? বিপ্রদাসের আন্তরিক অনিচ্ছা প্রকাশিত হলে কুমু কি পারত তাকে অগ্রাহ্য করতে? গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী কিংবা কুমুর নিত্স্ব কুসংস্কার এ ব্যাপারে যততা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী বিপ্রদাস নিতে। আঁচলে চাদরে গাঁতছড়া বেঁধে মধুসূদনের সঙ্গে কুমু যখন স্বামীগৃহে যাত্রা করল, সেই দৃশ্যতা বিপ্রদাসের চোখে বীভৎস লেগেছিল, কিন্তু এ দৃশ্য রচনায় তার দায়িত্বই কি সর্বাধিক নয়? ভবিষ্যতেও মধুসূদনের কাছ থেকে উকিলের চিঠি পেয়েও বিপ্রদাস নীরব থেকেছে। কোন দিক দিয়েই সে ভাঙন ঠেকাতে পারেনি। কুমুর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেলেই তাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে। এমন অসহায় এবং নিস্ক্রিয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আর একতিও আঁকেননি।

এবং কুমুদিনীকে তার স্রষ্টা বহু যত্নে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নায়িকার উপস্থিতি এমন 'দৈব আবির্ভাবের' মত নয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে তার তুলনা বারবার এসেছে। তার নিতোল দুতি হাতের সেবা 'কমলার বরদান' যা কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। ফুলশয্যার আগের রাতে তার ধ্যানস্থ মূর্তি দেখে মোতির মার মনে হয়েছে লক্ষ্মীর দ্বারে মধুসূদনকে অনেক হাঁতিহাঁতি করতে হয়েছে, এখন এই লক্ষ্মীর কাছে এসেও কি হাত পাততে হবে না? বিয়ের পরে মধুসূদনের মনে হয়েছে তার সমস্ত সম্পদ যেন এতদিনে 'শ্রীলাভ' করেছে। যদি সে রাত চক্রবর্তী সস্নাত হত তবেই তার ঘরে মানাত কুমুকে। 'প্রত্যাশার অতিরিক্ত' তার সৌণ্ডর্য দেখে মধুসূদনের মতো কঠিন মানুষেরও মনে হয়েছে — 'ও যেন ভোরের শুকতারার মত'। কিংবা তার উপস্থিতি যেন 'তুষার শিখরের উপরে নির্মল উষা দেখা দিয়েছে'। অপার্থিব সেই সৌণ্ডর্য তাকে দিয়েছে এক বিরল স্বাতন্ত্র্য। মধুসূদনের মনে হয়েছে — 'এর স্বভাবতি ত্মাবধি লালিত একতি বিশ্ত বংশমর্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর ত্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘ কালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে।' মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর মূলগত তফাত রচিত হয়ে যায় এখানেই। মধুসূদনে যে ভুঁইফোড় ধনী। তার বংশমর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়ে এখন 'ঘা খাওয়া নেকড়ের' মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে যে মধুসূদনকে তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে নিরেত বাস্তববোধ, গুলি পাকানো প্রতিজ্ঞা, কিংবা পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতার কাঠিন্য তো থাকবেই। সে তো কোনও স্নেহলালিত স্বপ্নচালিত, অপাপবিণ্ধ তরুণ নয়, সে ত্তীবনযুদ্ধের সাহসী সৈনিক। তবু তাকে পরাতিত দেখতেই চেয়েছেন তার স্রষ্টা। যে তৈবিকতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিল চতুরঙ্গের শচীশ, সেই শৃঙ্খলেই কুমুকে বাঁধল মধুসূদন। কিন্তু ত্তী হল কি?

সুণ্ডর কুৎসিতের দ্বণ্ডে ছিল 'রাত্র' নাতকেও। রাত্রর রূপ ভীষণ, ভয়াল। 'ধুমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মত কালো', 'ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো' তবু সেই কালোতেই নয়ন ভরলো সুদর্শনার, কারণ রাত্রর মধ্যে তুচ্ছ তো কিছুই নেই, সর্বত্র ব্যাপী প্রবল তাঁর অস্তিত্ব, যাঁকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও নেই। আর মধুসূদন যে আগাগোড়া তুচ্ছতার জন্য লড়াই করে গেল। তুচ্ছ নীলার আংতি, কাগত্তের পাথর চাপা, নকশা কাতা রুমাল — এসব নিয়ে ছেলেমানুষি লড়াইয়ে অপমান করল তার বয়সকে। বিপ্রদাস তো বতেই হাবুলও যেন তার প্রতিদ্বণ্ডী। 'রক্তকরবী'র রাত্রও ভয়ঙ্কর। লক্ষ্মীর জন্য নয়, অলক্ষ্মীর জন্যই তার সাধনা। তার আদেশে খোদাইকরের দল যখন মাতির বুকচেরা ধন 'কানারক্ষসের' অভিসম্পাত সহ বহন করে আনে, শ্রীবর্তিত সেই ধন তখন রাত্রকে সমৃদ্ধ করে না, বরং বিচ্ছিন্ন করে যা কিছু সত্তীব তা থেকে। তবু পরিশেষে সেই মকররাত্রের হাত এসে ধরে নণ্ডিনী। কারণ তার বিরাত শক্তির চেহারা যে আকর্ষণ করে নণ্ডিনীকে, তার নিঃসঙ্গতা যে করুণায় মথিত করে নণ্ডিনীর হৃদয়। কিন্তু তত্ত্বনাতকে সুণ্ডর অসুণ্ডরের যে সংঘাত মিলনান্তক সমাপ্তি পেয়েছে, বাস্তব কাহিনিতে সেতা ঘতল না। কারণ কুমুদিনী মধুসূদনের শক্তির দিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত রয়ে গেল। মোতির মাকে সে বলেছে বতে — 'আমি ওঁর যোগ্য না!....ওঁর কতবড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত পাকাবুণ্ধি, উনি কত মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কততুকু পেতে পারেন?'—

তখন মনে হয় মুখে একথা উচ্চারণ করলেও অন্তরে সে জানে মধুসূদনই তার যোগ্য নয় ? — ‘এত দিন কুমু বারবার বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো। আজ বিদ্রোহিণীর মন বলছে তোমাকে আমি সহ্য করব কি করে ? কোন লজ্জায় আনব তোমার পূজা ? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিল কোন দাসীর হাতে — যে হাতে মাছ মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, সেখানে নির্মাল্য নেবার জন্য কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগল দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।’ — এই গ্লানিবোধ আন্তরিক ঘৃণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। মধুসূদন নেহাতই হতভাগ্য, সে তো পূজা চায়নি। কুমুকে সে অমূল্য বলেই ভেবেছে। আর ছোট ছেলে যেভাবে অপ্রাপণীয় চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়, সেও ঠিক সেইভাবে চেয়েছে কুমুর প্রেম। তার পাকা ব্যবসাবুদ্ধি কুমুর কাছে এসেই বারবার পরাস্ত হয়েছে। বাণিজ্য লক্ষ্মীর প্রসাদ পুষ্ট মধুসূদন তার স্বকীয়া গৃহলক্ষ্মীর কাছ থেকে পূর্ণ আত্মসমপর্ণের বিনিময়েও শূন্য হাতে ফিরেছে।

আসলে কুমুর স্বামী সম্পর্কিত ধারনার সবটাই ছিল পুঁথি পড়া, পুরাণ ঘেঁষা, মধুসূদন যেখানে কোন ভাবেই খাপ খায়নি। ছেলেবেলায় শিবপূজার স্বামীর ধ্যানে সে দেখেছে রজতগিরিনিভ শিবকে। সেখানে কালো, বেঁটে, মস্তবড়ো বাঁকা নাক আর কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া চুলের মধুসূদন একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নিজেকে উৎসর্গ করার সঙ্কল্প নিয়েই কুমুর স্বামীগৃহে আগমন। তার অনুভব — ‘বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বাইরে তাকে দেখলে কই ? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা ? সেই সত্যকার রাজা কোথায় ?’ — মধুসূদনের ‘মহারাজা’ খেতাব তাকে সেই সত্যকারের রাজমর্যাদা দেয়নি, যে মর্যাদা ছিল কুমুর পিতৃকূলে। তার পিতা মুকুন্দলালের চরিত্রে স্খলন থাকলেও—‘সে চরিত্র ঔদার্যে বৃহৎ। পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিল না। যে একটা মর্যাদাবোধ ছিল, সে যেন দূরকালের পৌরাণিক আদর্শের’। তাই মুকুন্দলালের লাম্পট্য কুমুর কাছে ‘দুরন্তপনা’ মাত্র। আর মধুসূদনের প্রভুত্বব্যঞ্জক কর্কশ ব্যবহারে তার গভীর বিতৃষ্ণা। এতটা ঘৃণিত হবার মতো উপকরণ মধুসূদনের মধ্যে সত্যিই ছিল কি ? সে তো মুকুন্দলালের মত বারনারীআসক্ত নয়। বরং নারীদের প্রতি তার ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার ভাবই ছিল প্রবল। যদিও ক্রমশ কুমুদিনীর শীতল প্রত্যাখান তাকে ঠেলে দিয়েছিল শ্যামাসুন্দরীর দিকে। লেখক জানাচ্ছেন স্বামীর বয়স বেশি বলে কুমুর আক্ষেপ ছিল না। আক্ষেপের কারণ সেই বয়স তার মর্যাদা ভুলেছে। অতএব ‘যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুগম্ভীর এ তো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এতো বিতৃষ্ণা।’—শান্ত শুভ্রস্নিগ্ধ সুগভীর—এইসব বিশেষণগুলি মিলে যায় তার দাদা বিপ্রদাসের সঙ্গে। সেই বিপ্রদাসও যেন এক পৌরাণিক মানুষ। সে ‘ভীষ্মের মতো’, ‘তাপসের মতো’, কিংবা মোতির মার ভাষায় তার রূপ যেন ‘গোরাচাঁদের মতো’। মধুসূদন তেমনটি হবে কি করে ? বাস্তবের ধুলোমাটিতে মাখা তার শরীর, সেখানে কুমু তার দাদার প্রতিরূপকে খুঁজলে তো হতাশ হতেই হবে। সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর প্রেমের জন্য মধুসূদন যদি লালায়িত বা অসংযত হয়, তবে কুমু তাকে সইবে কি করে ? স্বামীর অধিকারে তাকে স্পর্শ করলে তাতেই বা সে সাড়া দেবে কিভাবে ? তার সুকঠিন যৌনশীলতা যদি মধুসূদনকে বুভুক্ষু অতৃপ্ত করে শ্যামাসুন্দরীর দিকে ঠেলে দেয় তবে পবিত্র ঘৃণায় উদ্দীপিত হবার অধিকার তো তারই আছে। কারণ কুমুদিনী যে — ‘সহজসম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে — ওকে ধনের দাম কষতে হয়না, হিসেব রাখতে হয় না — মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে ?’

মধুসূদনের রূপ ও বয়স কুমুদিনীর সচেতন মনের কাছে গুরুত্বহীন। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে মধুসূদন যদি কুমুর কল্পনার সেই রজতগিরিনিভ পুরুষ হত, তবে তার ‘পয়সাপূজা’ কিংবা ‘পরনারীগমন’ জাতীয় দোষগুলি কি কুমু ‘দুরন্তপনা’ বলে ক্ষমা করে দিতনা ?

আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বনাটকগুলিতে যেমন সত্যিকারের রাজার পাশে একজন নকল রাজ বেশধারীকে হাজির করিয়েছেন, এই উপন্যাসে বিপ্রদাসের মত সত্যিকারের রাজার পাশে মধুসূদনও যেন এক নকল রাজা। শারদোৎসবের সোমপাল, অচলায়তনের মন্থরগুপ্ত কিংবা ‘রাজা’ নাটকের সুবর্ণ—এরা সবাই রাজা সেজেছে। রাজা হয়নি। ‘মুক্তধারায়’ রাজা রণজিৎ নয়, পিতৃপরিচয়হীন অভিজিৎই রাজ চক্রবর্তীর লক্ষণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। শুধু তত্ত্বনাটকে নয়, বীজ আকারে এই তত্ত্ব আরও আগে প্রকাশিত হয়েছে ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ (১৮৯৬) নাটকে। দাসী ক্ষীরো রানী সাজতে চেয়েছিল রানী কল্যানীকে অতিক্রম করে। কিন্তু স্বপ্নে রানি সাজলেও তার নিজের কাছেও ক্রমশ প্রকটিত হল দাসীর মনস্তত্ত্ব। মধুসূদনও তার অর্জিত ধনরাশির উপরে বসে নিজের ‘গোলামি’ করে গেছে। সরকারী ‘রাজ খেতাব’ তাকে কুমুর স্বপ্নের সেই ‘সত্যকার রাজা’ করে তোলেনি। তাই ‘রক্তগত দারিদ্র’ মহারাজা মধুসূদন ঘোষালকে ‘শেয়ালকাঁটা বনের রাজা’ করেই রেখেদিল। কুমুর সঙ্গে তার অসফল দাম্পত্যের করুণ তিক্ত কাহিনী আসলে সেই অভিজাত অনভিজাতের শ্রেণী সংঘাত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। যোগাযোগ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। জীবনস্মৃতি / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। ছেলেবেলা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর